Ababhash – Prabondho – Others – Rabindranatther Chabir Katha – Tapan Bhattacharya
অবভাস - রবীন্দ্রনাথের ছবির কথা - তপন ভট্টাচার্য

উনিশশো তেইশ সালে রক্তকরবী নাটক লেখার সময় বা বরং বলা যায় বার করে লেখা কাটাকুটি করার পর্যায়ে সেই কাটাকুটিরই রবীন্দ্রনাথ আরেকটা রূপান্তর ঘটিয়ে ফেলেন তার ভেতর একটা বিস্ফ নির্মাণ করে। কিন্তু লেখার কাটাকুটির এ-ও যে এক সম্ভাবনা রয়েছে। নান্দনিক অনুভবে রূপান্তরিত হবার, এমন নূতন অভিজ্ঞতায় বিস্মিত হয়েছিলেন তিনি নিজেই। রবীন্দ্রনাথের ভেতর সারাক্ষণ কাজ করত আত্মসমালোচনার প্রক্রিয়া, যা কেবল বিবেকী নয় বরং নান্দনিক, সাংস্কৃতিক। তাই এই ধারার অনুভবের ভেতর দিয়ে তিনি ক্রমাগত নিজেকেও মেপে নিতে পারতেন। তিনি গভীর করে অনুভব করেছেন, যে তিনি এক রোমান্টিক মনের অধিকারী কিন্তুসেই মনও কতটা সৃষ্টিশীল ও ব্যাপক তা তিনি নিজেই নিজেকে অহরহ প্রশ্ন করতেন। ফলে সমাজ, পরিবার, দেশ ও শান্তিনিকেতন নিয়ে যেমন আকর্ষণ বোধ করেন, তাদের প্রতি দায়িত্বও পালন করেন। কিন্তু আবার তার থেকে দূর কোনো মনোলোকের বাসিন্দাও তিনি, তার ভেতরের শিল্পীমন এক গভীর অনুভবের ব্যক্তিমনও। পূর্ণ এক একক তিনি তখন।

রক্তকরবী-র শেষ পাতার পাণ্ডুলিপিতে যে-কাটাকুটি তিনি করেছিলেন তাতে যে অচেনা কোনো পশুর রূপ ফুটে উঠেছিল, তা-ই পূর্ণতর রূপ নিল পরের বছর ১৯২৪-এ, যখন তিনি পূরবী লিখছিলেন। দক্ষিণ আমেরিকার বুয়েনোস এয়ারেস, যাত্রার সমকালীন ওই সালেরই শেষ তিনটি মাসে তিনি প্রায় প্রত্যেক দিন পূরবী-র কবিতা লিখেছেন। এক তীব্র আবেগের ভেতর তিনি যে এক নূতন দেশে এসে উপস্থিত হয়েছেন, বা এসে দাঁড়িয়েছেন নদীর এমন পাড়ে যেখানে আধুনিক কালে তার আগে কেউ পৌঁছোননি, পূরবী-তেও তিনি নিজেই বলেছেন 'সেই অদেখা দূর পারে।' কিন্তু সত্যিই কী ঘটেছিল পূরবী-তে? তিনি কি কবিতাই লিখছিলেন? কিন্তু তা-ই যদি লেখেন তা হলে অক্ষর কাটাকুটি করতে গিয়ে ছবিতে পৌঁছে যাচ্ছিলেন কী করে? কেননা না দেখা গেলে লেখা যেমন পড়া যায় না তেমনই যে-কোনো লেখা, এমনকী পাণ্ডুলিপিও দর্শনীয় কোনো ছবি হতে পারে না। লেখার ব্যাকরণ ও পাঠ এবংছবি আঁকার ও দেখার নান্দনিক অভিজ্ঞতা এক নয়।

অপরদিকে ছবি নিজের জায়গা তৈরি করে নিতে গিয়ে লেখা যে-আনুভূমিকে অগ্রসর হয় তাকে বাধা দেয়। লেখাও যেন ভিন্ন মাত্রায় ভিন্ন কায়দায় ছড়িয়ে পড়ে। ছবিতে যাকে দেশ বা space বলে তাই যেন রকমফেরে জায়গা করে দেয় লেখাকেও। পূরবী-তে এমন ঘটেছে বার বার। কোনো অক্ষর বা বাক্যের একটা অংশ যেন ছবির অলিগলিতে ঢুকে পড়ে। তখন প্রশ্ন হয়, লুকিয়ে পড়ছে কি এই লেখাগুলি ছবির মায়াজালে? এইভাবে লেখাও পেয়ে যায় নূতন এক মাত্রা।

পূরবী-তে এই দুই -এর খেলায় মেতে রবীন্দ্রনাথ নিজেই প্রশ্ন তুলেছিলেন

একি সেই নিত্য শিশু, কিছু নাহি চাহে,
নিজের খেলেনা চূর্ণ
ভাসাইছে অসম্পূর্ণ
খেলার প্রবাহে?

এই কবিতাটি পাণ্ডুলিপির যে পৃষ্ঠায় আছে তাতেও যে প্রাচীন এক পুরাণকল্পের মতো এই ড্রইং দেখি আমরা। প্রোফাইলে এক নারীমুখ যায় এক অংশ পাখিতে রূপান্তরিত হয়ে রেখার কাটাকুটিতে যেন আরও কোনো অচেনা অবয়বে নেমে গেছে।

এমনই ঘটেছে নানান কবিতা - ছবিতে। অহরহ কত বিস্ময় প্রত্যক্ষ করি আমরা। কোনো কোনো ছবিতে লেখা আর কোনোদিনও পড়া যাবে না, পুরোটাই ছবিতে ঢেকে গেছে কিন্তু সম্পূর্ণ উধাও হয়ে যায়নি। চিহ্নগুলি (traces) রয়ে গিয়েছে। ভালো করে দেখলেই ছবির প্রবাহের নীচ দিয়েই যে লেখার ফল্গুধারা বয়ে চলেছে এবং তা যে রবীন্দ্রনাথের এবং কেনোদিন পড়া যাবে না ভাবতেও কেমন শিহরণ খেলে যায়। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, কেন পুরো পূরবী-ই তার ছবি ও লেখা সহ প্রকাশিত হয়নি একটা বইতে? সে হতে পারে এক আশ্চর্য বই।

এ ক্ষেত্রে যা ঘটেছে তা হল লেখার যে রেখা - বরাবর ধরা তা বিম্বকে radicalize করছে এবং অন্যদিকে বিম্বও ক্রমাগত বাধা দিয়ে চলেছে লিখিত শব্দের লজিক প্রবাহকে। রবীন্দ্রনাথ বিম্বও লিখিত শব্দের ধারার মিলন দিয়ে নির্মাণ করে নিচ্ছেন এক একটা ছবি। বিম্বর কারণেই লেখা পেয়ে যাচ্ছে এমন অজানা দেশ বা space, সাধারণত লেখার জন্য খাতায় বা সাদা কাগজে যা ব্যবহার হয় না।

এই যে রবীন্দ্রনাথের image-text তা যেন ক্রমাগত চেষ্টা শিল্পের এক সম্পূর্ণতা নির্মাণের যেখানে বিস্ফ, কবিতা, রং এই তিনের প্রবাহ এক আশ্চর্য গন্তব্যে মিশে যায়। এমন image-text -এ শিল্পমাধ্যমগুলি একে অপরের পরিপূরক হয় এবং তার চূড়ান্ত পর্যায়ে গভীরতা, রহস্যময়তা ও শৈলী একাকার হয়ে যায়।

এ ক্ষেত্রে এ কথা বলাও প্রাসঙ্গিক হবে ষাটের দশকের পর উত্তর - আধুনিক যুক্তি ও বয়ানে লেখা ও বিম্ব একাকার হয়ে গিয়েছে নানা শিল্পীদের কাজে। তা ঘটেছে চিত্রকলায় যেমন তেমন ভিডিও (video), উপস্থাপনা (installation) শিল্পেও। এবং তার আধুনিক পূর্বসুরী হলেন রবীন্দ্রনাথ এবং পরবর্তীকালে ১৯৪৬-৮-এরকরা শিল্পী আন্তোনিন আর্তোর আঁকা - লেখায়।

এই প্রসঙ্গে ২০০৫ সালে প্রকাশিত 'Angkor the Silent Centuries' প্রদর্শনীর ক্যাটালগে আধুনিক ভারতীয় শিল্পী গুলাম মহম্মদ শেখের মন্তব্য রবীন্দ্রনাথের এই image-text প্রসঙ্গেও খাটে।

> 'There is a very meaningful relationship between writing and painting. Our painting tradition has been suffused with it. But now we have developed a purist mode where we have separated the two. This is like saying that when you see you should shut your ears, while you hear you should shut your eyes. You do not. You cannot. Those who have studied perception will realize the correlation between the senses."

ফলে ১৯২৪ সালে অসুস্থ ও শ্রান্ত রবীন্দ্রনাথ তার ইউরোপের সেক্রেটারি লিওনার্ড এল্‌মহার্স্ট ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সাহচর্যে বুয়েনোস এয়ারেসে থেকে যান। সে সময়ে পেরু যেতে না পেরে পূরবী লিখতে গিয়ে তিনি যে - সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন তা কেবল সাহিত্যের সমস্যা নয়, তা দেখারও সমস্যা, ছবির সমস্যা। এ কারণেই পাণ্ডুলিপি সংশোধনের, কাটাকুটির সামঞ্জস্যহীনতাও তাঁর অসহনীয় মনে হয়েছিল। লিখতে লিখতে কখনো ছবি এঁকেছেন, দু-একটা রেখার টান দিয়েছেন লেখক কাফকা, দস্তেয়ভস্কি, পুশকিন, কিন্তু তা ছিল লেখার একঘেয়েমি থেকে সাময়িক অব্যাহতি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মুখোমুখি হয়েছিলেন সম্পূর্ণ নূতন এক সমস্যার। সেটা বাক্য ও ছবির সমগ্রতা নির্মাণের সমস্যা এবং তা অবশ্যই ছন্দহীন রূপের সমগ্রতা। এ-কথাও মনে রাখা দরকার, এমনভাবে লিখতে - আঁকতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনাদর করেননি তাঁর লেখার, পূরবী তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থগুলির একটি।

রবীন্দ্রনাথের ছবিতেও কালি কলমের ভূমিকা বরাবরই প্রধান থেকে গেছে অথবা পেনসিল। যেন তিনি যে-যে সরঞ্জাম দিয়ে লিখতেন তাই দিয়ে নির্মাণ করতে চাইলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন ছবির জগৎ। অন্তত শুরুতে তাই ছিল।

সরু, মোটা, বক্র, কৌণিক রেখার বুনটে তিনি এমনভাবে drawing করেছেন যে তার তারই ভাষায় 'সাদা - কালোর বিরহ মিলনের খেলা'। এই বুনটের নকসা এচিং এর মতো যেন বার বার দাগ কেটেকেটে তিনি যেন ম্যাজিকাল কোনো বাস্তবতায় পৌঁছে যাচ্ছেন। ড্রইং-এর ভেতর দিয়ে এক অজানা ফ্যান্টাসি - পৃথিবীর মুখোমুখি। এর অন্তত একটা কারণ হল রবীন্দ্রনাথের ছবির spontaneity। ছবি যেন নিজেই তরতর করে নেমে আসছে, যে-কারণেই idealisation ঘটছে না।

প্রথম দিককার ছবিতে তার পটের পেছন যেন অন্ধকার হয়ে থাকত। তার থেকে কোনো অজানা দূরতর পাখি, জন্তু নারী -পুরুষের মুখ বা শরীর ঠেলে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে এবং তার আঁকাতে এই spontaneity-র জোরটাই প্রথমত ধরা পড়েছে। ১৯২৮-এর ৭ নভেম্বর তারিখে রবীন্দ্রনাথ রানি মহালনবিশকে চিঠিতে তা জানিয়েছেনও। তিনি লিখেছেন, কবিতায় একটা বিষয় আগে থাকতেই তৈরি হয়ে যায় এবং তা ছন্দে ভাষায় পরে পূর্ণতা নেয়। কিন্তু ছবির ক্ষেত্রে প্রথমে একটি রেখা এবং তার পরে একটি আকার। এই আকার যত ঝকঝকে, ছবির গুণগত মানও তত উঁচুতে। তিনি লিখেছেন, কবিতায় একটা বিষয় আগে থাকতেই তৈরি হয়ে যায় এবং তা ছন্দে ভাষায় পরে পূর্ণতা নেয়। কিন্তু ছবির ক্ষেত্রে প্রথমে একটি রেখা এবং

তার পরে একটি আকার। এই আকার যত ঝকঝকে, ছবির গুণগত মানও তত উঁচুতে। তিনি লিখেছেন, চিত্রকলায় পারদর্শী হলে হয়তো তিনি একটা প্রাক্ - ধারণা নিয়েই আঁকতেন। কিন্তু এমনভাবে ছবি আঁকতে গিয়ে এক অজানার তিনি সম্মুখীন যে-অজানায় রয়েছেআত্ম - আবিষ্কারের নূতন নূতন আনন্দ। এই যে নিজের আঁকার পারদর্শিতা নিয়ে ধন্দে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ তা আসলে সৃষ্টিশীলতাও, কেননা এমন বোধ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অজানা নির্মাণ করে। তাঁর আঁকার যে অত বড়ো বড়ো প্রদর্শনী তার জীবিতকালেই দেশে বিদেশে ঘটেছে এবং বিদেশে তা যে অভিনন্দিত তা জেনে আনন্দিত হলেও তাঁর আঁকার পারদর্শিতা নিয়ে সন্দেহ ১৯৪১-এর বিদায়বেলায়ও তাঁর যায়নি। তিনি লিখছেন, '...আজ পঞ্চাশ বছর ধরে ভাষার সাধনা করছি। সুতরাং তার সমস্ত কৌশল তার গতিবিধির নিয়মসে আমি একরকম জেনে নিয়েছি। কিন্তু এই ছবি যা অকস্মাৎ আমার স্কন্ধে আবির্ভূত হয়েছে, তার সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ চেনাশোনা হয়নি। তার স্বৈরাচার আমাকে পেয়ে বসেছে। কিন্তু স্বৈরাচারের অন্তর্নিহিত যে নিয়ম তাকে ভিতরে ভিতরে চালনা করে, সে আমারকাছে অত্যন্ত গোপনে আছে। ...এই চিত্রকলা আমাকে এড়িয়ে চলে।...কিন্তু বর্ণ বিন্যাস ও রেখা বিন্যাস, সে নিস্তব্ধ, তার মুখে বাণী নেই, তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে সে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেয়, ওই দেখো, আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা কোনো না।' (২৩শে জুন, ১৯৪১ প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৮, বিশু মুখোপাধ্যায়কে লেখা)।

যে-রেখা দিয়ে একটা সীমা টানেন শিল্পী, সে সীমায় অজস্র আকার জড়িয়ে আছে যা একটি বিশুদ্ধতার প্রতি ধাবমান। রেখারপ্রকাশে ও সংযমে এই যে দৃষ্টিগ্রাহ্য হওয়া, সেখানে মুক্তি এবং দেখার আনন্দ ছাড়া আর কিছু নেই এমনই ভাবতেন তিনি। কিন্তু সারাজীবন ধরে কম বাণী তো তিনি রচনা করেননি তাঁর কবিতায়, গদ্যে, তার থেকে দূরে চলে যাবার ইচ্ছেটাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এমন লেখায়। ফলে ছবি ছিল রবীন্দ্রনাথের আরেকটা স্বীকারোক্তি যে তিনি সমাজনিরপেক্ষ কোনো গহন ও আত্ম - আবিষ্কারকে সমর্থনকরেন। তাই তাঁর লেখা যেমন করে বাংলার রেনেসাঁসের সঙ্গে যুক্ত তাঁর ছবির গতিক্রিয়া ঠিক যেন তার বিপরীত। এ কারণেই রবীন্দ্রনাথ ছবিতে ১৯৩২ পর্যন্ত 'শ্রী রবীন্দ্র' বলে সই করতেন, তার পর শুধু 'রবীন্দ্র'। বেঙ্গল স্কুল, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু) যাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় তাঁর জীবন গড়ে উঠেছে) তাঁদের থেকে বরাবরের মতো আলাদা ছিলেন তিনি। আঁকার অহেতুক আনন্দ ছাড়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার চূড়ান্ত প্রকাশ ছাড়া আর কোনো agenda ছবির ক্ষেত্রে তিনি নিতে রাজি ছিলেন না। আরেকটা কারণেও তিনি তাঁর সমকালীন বাঙালি শিল্পীদের থেকে স্বতন্ত্র। তিনি খুঁজেছেন তাঁর ছবির জন্য তেমন দর্শক যারা কেবল তাঁর দেশবাসী নয়। সচেতনভাবে অন্য কেনো দেশে ছবির দর্শক খুঁজে বার করার প্রচেষ্টা এমন করে তাঁর সমকালীন অন্য কোনো বাঙালি চিত্রকর কেউই করেননি।

তাঁর মতো জোরের সঙ্গে কেউ বলেননি যে ছবি দেখার জন্য যে-শিক্ষা দরকার এবং যা ব্যতীত ভালো দর্শক বা সমালোচক হওয়া যায় না তার অভাব রয়েছে এ দেশে এবং সে কারণেই ছবির প্রতি শ্রদ্ধাও এখানে স্বাভাবিকভাবে আসে না। এত জোর দিয়ে তিনি বলতে পারতেন যেহেতু তিরিশের দশকের পর থেকে তিনি উপযুক্ত সমালোচনা ও দর্শক ভিক্টরিয়া ওকাম্পো থেকে আরও কয়েকজন বিদেশিদের দৌলতে পেয়েছিলেন। প্রতিমা দেবীকে আগস্ট ১৯৩০-এ লিখেও জানিয়েছিলেন এমন কথা 'ভিক্টরিয়া যদি না থাকত তাহলে ছবি ভালোই হোক মন্দই হোক কারো চোখে পড়ত না।...আর যাই হোক আমার ছবি দেশে ফিরতে দেব না- অযোগ্য লোকের হাতে অবমাননা অসহ্য।'

এমন লেখা থেকেই প্রমাণিত হয় কোথাও রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেশবাসী বিশেষত বাঙালিদের কাছ থেকে মানসিকভাবেই দূরতরহয়ে গিয়েছিলেন, অন্তত ছবির ক্ষেত্রে তিনি যে বহিরাগতর মতোই আচরণ করেছেন কেবল নিকট কয়েকজন বাদে। এবং এই কারণেই তাঁর আঁকার প্রেক্ষাপটে তিনি যে - সংস্কৃতির কথা ভেবেছেন তাতে তাঁর সাহিত্য ও জাতীয়তার বোধে যে ওরিয়েন্টাল ভাবনার প্রতি সমর্থন ছিল তা কাজে আসেনি। বরং বার বার পশ্চিমের দর্শক, সমালোচকদের কথা বলেছেন। এবং 'রবি' শব্দটার অর্থও করেছেন এমনভাবে। তার উদয় যদি পূবে হয় তবে শেষের কাজে তার সাথী পশ্চিম। ছবি আঁকার সময়কে তিনি 'play time' বলেছেন রদেনস্টাইনকে একটি চিঠিতে, তাতে ছিল বাংলা দেশের মামুলি দর্শক - সমালোচকের বিচারবুদ্ধির প্রতি তীব্র অনাস্থা।

এদিক দিয়ে ফরাসি সমালোচক হেনরি বিডউ মে মাসের ১৯৩০-এর প্যারিসে গ্যালারি পিগ্যালে রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শনী দেখে যে - সমালোচনা লিখেছিলেন তা আজও অনুধাবনযোগ্য ও প্রাসঙ্গিক।

His verses communicate images seen or created. On the contrary, when he becomes a painter (and this is the strongest part of the story), exactly at the point at which others begin to copy, he ceases to copy. His pictures do not represent a scheme preconceived in his mind. So far from seeing them beforehand, he actually does not know, while he is doing them, what they are going to be. So in producing his poetry, he worked as a painter; now that he is a painter, he works like a poet. The whole of this new work is in the borderline of two arts.

এ ক্ষেত্রেও হেননি বিডউ সঠিকভাবেই বলেন যে, রবীন্দ্রনাথের ছবি অবচেতনার শরিক যেহেতু তার কাজের শুরুতেই ছকেদেওয়া হয়নি। আরেক অদ্ভুত যোগাযোগ) ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকতে শুরু করছিলেন, আর সে বছর থেকেই প্যারিসে শুরু হয় সুররিয়েলিজম্ অর্থাৎ অবচেতনা নির্ভর কাজ। হেনরি বিডউর মত যে, রবীন্দ্রনাথের ছবি - কবিতা intertextuality-র উপর ভিত্তি করেই ঘটে চলেছে। ইংরেজিতে 'text' শব্দটার সঙ্গে যে গূঢ় ভাবে 'textile' -এর যোগ। রবীন্দ্রনাথের ভাষা - ছবিতে সেই বুননই প্রত্যক্ষ করি আমরা। এই যে নানান শিল্পকলার ভেতর পারস্পরিক যোগ রয়েছে এবং যে-কোনো একটি শিল্পকর্মের অভিজ্ঞতা অপর কোনো শিল্পমাধ্যমের দিকে ঠেলে দেয় শিল্পীকে, রবীন্দ্রনাথ তারও যেন উজ্জ্বল প্রমাণ।

।। দুই।।

তিনি নিজেই তাঁর আঁকায় পটুতার অভাবের কথা বলেছেন নিঃসংকোচে। কিন্তু এই দুর্বলতাকে ছাপিয়ে গেল তাঁর সংবেদনশীল মনন, গভীর সাংস্কৃতিক বোধ। 'রেখার বিশ্বে' বা খেয়াল-ছবির জগতে তিনি যে ঢুকলেন তার কারণ বোধ হয় এই যে, লেখার ভেতর বা লেখা কাগজটায় যে বিমূর্ততা রয়েছে তাতে তাঁর মন পুরোপুরি সায় দিচ্ছিল না। তিনি ছবিকে বলেছিলেন, 'প্রত্যক্ষ অস্তিত্বের সাক্ষী'। যেন ছবির ভেতর দিয়ে জীবন্ত কারো সান্নিধ্য পাচ্ছেন তিনি, ছবির ভেতর যে বিস্ফতা গূঢ়ভাবে জগৎ, জীবন ছুঁয়ে যায়) এণনই ভেবেছেন তিনি। দৃষ্টির মহাযাত্রায় এই যে বিশ্বাস তা primitive শিল্পীদের মত। গুহাবাসী শিল্পী বাইসন এঁকেছেন এই বিশ্বাসে বা তারও পর প্রাচীন শিল্পকলায় যখন আফ্রিকান বা মেক্সিকান শিল্পী থেকে নাগা বা বাস্তারের শিল্পী যে ছবি এঁকেছেন বা মূর্ত্তিগড়েছিলেন কোথায় যেন সেগুলি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের সঙ্গে মেলে। হয়তো এত যে নারীমুখ, শরীর এঁকেছেন তা তাঁর কাছে হয়েদাঁড়াচ্ছিল 'প্রত্যক্ষ অস্তিত্বের সাক্ষী। মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর অনেক পরে তিনি অনুভব করেছিলেন নিশ্চয়ই তাঁর যৌনতার দাবি অতৃপ্ত না হলেও অসম্পূর্ণ যদিও সামাজিক ঘেরাটোপ ভেঙে তিনি বেরিয়েও আসবেন না। এতদিনকার ঐতিহ্য ভেঙে তা নিয়ে তাঁর পক্ষে লেখাও সম্ভব ছিল না হয়তো। তাই ছবির মাধ্যমেই তিনি তাঁর অসম্পূর্ণ eros-কে পুনর্নির্মাণ করতে উদ্যোগী হন, এমন একটা অনুমান থেকেই যায়। কেননা ছবি প্রত্যক্ষ অস্তিত্বের সাক্ষী হলেও তা বাঞ্জনায়, প্রতীকী অনুভবে সামাজিক পরিসরের থেকে আলাদাএক জায়গার জিনিস। শিল্পের দেশ আর সামাজিক দেশ এক নয় এবং শিল্পের দেশে আপনি এমন কতকগুলি স্বাধীনতা পেয়ে যান যা কিছুতেই সামাজিকভাবে আপনি পেতে পারেন না, পেলে তা অসামাজিক বলেই গণ্য হবে। রবীন্দ্রনাথের অসম্পূর্ণ eros- যা কোনো fatal attraction নয়- তারও একটা শৈল্পিক পরিণতির প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। আর এই অসম্পূর্ণ eros-এর উপরোধে তিনি খুব দ্রুত এঁকে নিতে চাইতেন, একটা sitting-এ প্রায় ঝড়ের গতিতে ছবি আঁকা সম্পূর্ণ হয়ে যেত। কিস্তিতে উপন্যাস লেখার মতো নয় এই কাজ, এতে তাঁর নিটোলতা,সম্পূর্ণতা কোথাও নেই। রবীন্দ্রনাথই প্রথম আধুনিক ভারতীয় শিল্পী যিনি নিজেকে উন্মোচন করতে গিয়ে বুঝেছিলেন যে, নিজের যৌনতার গভীরে নেমে, যে- কোনো রকম কুণ্ঠা লজ্জা সরিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে হয়। কিন্তু এই প্রকাশও ব্যক্তিগত নয়, ঘরের কোনো অন্ধকারে হারিয়ে ফেলার জিনিস নয়, বরং তা দর্শকের কাছেও উপস্থিত করার জিনিস। একজন সাধু আত্ম - উন্মোচন করতে পারেন কোনো গুহায় একাকী কেননা তার ঈশ্বর অনুভবের সরাসরি কোনো মূল্যায়ণ হতে পারে না। কিন্তু শিল্পীকে দর্শক খুঁজে বেড়াতে হয় কেননা সহযাত্রী দর্শক ছাড়া শিল্পীর চলে না। শেষ পর্যন্ত ছবি একটা সামাজিক ঘটনা, যদিও শিল্প নির্মাণের ক্রিয়াটা সামাজিকনা-ও হতে পারে, বরং তা ব্যক্তিগত থেকে যায় শিল্পীর কাছে। সাধারণভাবে বেশির ভাগ শিল্পীই সৃষ্টির দিক থেকে নিজেকে আঘাত করতে পারেন না, আত্ম - উন্মোচনের আরও কী কী ধাপ বাকি তার খোঁজ করেন না। তাঁরা কিছু বছরের সাধনায় একটা form language -এ উপস্থিত হন এবং সেখানেই থেকে যেতে চান যদি তাঁর কাজ ক্রেতারা বহু মূল্য দিয়ে কেনেন এবং সমালোচকদের নিয়মিত প্রশংসা ও দর্শকের উচ্ছ্বাস তাঁরা পেয়ে যান। (এবং আমাদের দেশে ছবির ক্রেতা ও বড়ো গ্যালারি জুটলে এই দুটো জিনিস ফাউ হিসেবেই পাওয়া যায়)। তাই পরিণত বয়সে শিল্পীরা এক ধরনের স্থিতি লাভ করেন যা আসলে একটা জড়তা। রবীন্দ্রনাথ নিজেকেই ধাক্কা দিতে উদ্যোগী হলেন এবং ছবির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিজস্ব ও অজানা territory-তে উপস্থিত হলেন। নিজেকে এই যে সাংস্কৃতিকভাবে আঘাত করা তা কঠিন কাজ এবং কখনো কখনো তা আত্মহত্যারই সামিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তা হল না, বরং তিনি পেরেছেন নতুন করে নিজেকে জাগিয়ে দিতে। তাই পরবর্তীকালে তাঁর আঁকায় লেখাওসরে গেল। অনেক বড়ো মাপের ছবি আঁকাতেও তিনি প্রয়াসী হলেন। প্রথম দিকের image text - এর তুলনায় পরবর্তী ছবির আত্মবিশ্বাসের ধরনটা ভিন্ন, কিন্তু আত্ম - উন্মোচনের প্রক্রিয়াতে সেখানে কোনো বিরাম নেই। যদিও পরের দিকেও তাঁর ছবিতে লেখা কখনো কখনো এসেছে কিন্তু তা বিস্ফথেকে আলাদা হয়ে গেছে। যেমন যেমন একটা ছবি এঁকেছেন বা ড্রইং, তার পাশে তিনি হঠাৎ অনুভব করে দু-একটা লাইন লিখে রেখেছেন বা কারো নাম। ১৩৪৮ - এ প্রতিকৃতি study করেছেন এমন কাগজে রবীন্দ্রনাথ লিখে রেখেছেন, 'বিছানায় চিৎপাত হয়ে ছেলেমানুষি করা গেল - রবিঠাকুর'। কেমন যেন বোঝা যায় না, এই বাক্যটার অর্থ কী, যৌন ইঙ্গিত রয়েছে কি না

তেমন সন্দেহও হয়। কিন্তু নিশ্চিত বলা যায় এমন স্বীকারোক্তি ছবির একপাশে করে রেখেছেন যাতে সহজে কেউ না পড়েন লাইনটা। সাধারণত ছবিতে বিম্ব মানুষ যেভাবে দেখেন text তেমনভাবে পড়েন না। তাই হয়তো এমন স্বীকারোক্তি ছবির পাশে। অপরপক্ষে এমনও হয় text পড়তে গিয়ে প্রথমবারের মত বিম্বটি দেখলেন না দর্শক।

।। তিন।।

রবীন্দ্রনাথ সাদৃশ্য মেনে ছবি আঁকতেন না। তিনি হয়তো চোখে দেখছেন যা, আঁকছেন তার চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা কিছু। মৈত্রেয়ী দেবীর বিখ্যাত মংপুতে রবীন্দ্রনাথ বইতে তেমনই একটা আশ্চর্য মজার ঘটনার উল্লেখ আছে। মংপুতে পাহাড় দেখে দেখে তিনিএকটা ভূদৃশ্য আঁকলেন যা তিনি মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে উল্লেখ করলেন 'সুরুলের বন' হিসেবে। কোথায় মংপুর পাহাড় রইল, বরং ছবি হয়ে উঠল বোলপুরের কাছেই সুরুলের বনের। কিন্তু এ-ও রবীন্দ্রনাথের মানস ভাবনা, বরং ওই ভূদৃশ্যের সঙ্গে সরাসরি সুরুলের বনের যোগ খুঁজতে যাওয়াও অকারণ। এটা তাই যা হল তা ছবিতে আঁকা এক দৃশ্য অভিজ্ঞতা।

রবীন্দ্রনাথের ছবিতে 'মা ও শিশু' এমন সনাতন দ্বন্দ্বপ্রন্দ-ও যখন এসেছে তখনও তা প্রকৃতি হিসেবে আসেনি বরং আদর্শায়িত করেই তা আঁকা। এ ক্ষেত্রে লেখক অরুণ নাগের থীমা প্রকাশনা থেকে ২০০৫ -এ প্রকাশিত গল্প ও তার গরু বইয়ের 'বিচিত্র বিচার' প্রবন্ধ থেকে ছোট্ট একটা উদ্ধৃতি দেওয়া যাক।

> কোন শিল্পী বাস্তববাদী রীতিতে মা ও শিশুর ছবি আঁকলেন কিন্তু বাস্তব কোন মা ও শিশুকে দেখে নয়, কল্প না থেকে। তথাপি বাস্তবতার কোন নীতি যদি রূপাকার নির্মাণে লঙ্ঘিত না হয়, তা হলে তার বাস্তববাদী দ্যোতনা অক্ষুন্নই থাকছে।

রবীন্দ্রনাথের ড্রইংয়ের হাত সীমাবদ্ধ, কিন্তু নিজেই সে সম্পর্কে সচেতন। যেমন তিনি প্রায় একই রকমের খাড়া না আঁকতে পারতেন, মুখ আঁকতে গিয়ে তাঁর গোলাকৃতি (oval) আঁকার দিকে যে - ঝোঁক তাকেই কাজে লাগাতেন। কিন্তু করার মতো হল, ড্রইংয়ের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তিনি জানতেন একটা ছবিতে কোথায় নিয়ে গিয়ে শেষ করতে হয়, ফলে ছবি দেখে রসভোক্তার রস অনুভবে পূর্ণতা আসেই।

সীমাবদ্ধতা ছিল ছবিতে রং দেওয়ার ক্ষেত্রেও। বর্ণান্ধতার কারণে তিনি নিজে যে-রং ভেবে ছবিতে রং দিচ্ছেন সেটা বর্ণান্ধতা নেই এমন দর্শকের কাছে অন্য রঙের ছবি বলে মনে হবে। আজকে স্ক্যানিং ও ডিজিটাল টেকনোলজির সাহায্যে বার করা যেতেই পরে রবীন্দ্রনাথ কী রং ভেবে ছবিটি সম্পূর্ণ করেছেন এবং আসলে ছবিটি কী হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এতদিন পর্যন্ত তাকেই original ছবি বলা হয় যেটা শিল্পী এঁকেছেন এবং দর্শক যখন সেই ছবিটিই দেখেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে শিল্পী যে-রং ভেবে orgingal ছবিটি এঁকেছেন, দর্শক দেখছেন সম্পূর্ণ আরেকটা original ছবি। প্রসঙ্গান্তর হলেও এমন হয়েছিল অবনীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ভিন্নভাবে। তিনি ইতালীয় শিল্পী গিলারি ও অন্যান্যদের কাছ থেকে যে পশ্চিমি শিল্পশিক্ষার পাঠ নিয়েছিলেন তা যখন তিনি মুঘল রীতিতে পরে আঁকতে যান, তা 'শাজাহানের মৃত্যু'ই হোক বা 'আরব্য রজনী', তাতেও সেই আলোছায়ার প্রেক্ষিত (shading) ও দর্শনানুপাত বা perspective পশ্চিমি দেশের কায়দায় থেকে যায়। তাই তা-ও হয়ে দাঁড়াল সম্পূর্ণ নিজস্ব অবনীন্দ্র চিত্রধারা। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ তথ্যের অভাব তার ছবি নিয়ে লিখতে গিয়ে অনুভূত হয়। তা হল তিনি যে নানা দেশে এতবার করে যেতেন সেখানে কোথায় কোথায় কী মিউজিয়াম, চিত্রকলা দেখে এসেছেন তার সম্পূর্ণ তথ্য এখনও কাছে নেই। এমনও হতে পারে রাশিয়া ও ইউরোপ ভ্রমণ কালে তিনি অসংখ্য বাইজেনটাইন ও মেডিয়াভাল ছবি দেখেছিলেন যা থেকে হয়তো এত frontal প্রতিকৃতি আঁকার অনুপ্রেরণা তিনি পেয়ে থাকবেন। ফলে প্রথম দিকের doodles-গুলিতে যেমন প্রিমিটিভ অনুপ্রেরণা বা সুমাত্রা, জাভা, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা কাজে এসেছে, তেমন পরবর্তী ছবিতে অনুপ্রেরণার দেশ হয়তো মেডিয়েভাল ইউরোপ, ননসেন্স লিটারেচার ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতেই পারে আর্তোও বালি দ্বীপ ও ওই অঞ্চলগুলির শিল্পকর্ম দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন।

শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের ভেতর আত্মপ্র তিকৃতিও রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি এঁকেছেন। নন্দলালের খুবই সুন্দর ছোটো ছোটো আত্মপ্রতিকৃতি রয়েছে কয়েকটা। বিনোদবিহারীর একটি আত্মপ্রতিকৃতি (কলাভবন সংগ্রহ) তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ। অন্য কয়েকটা রয়েছে গ্রাফিক্স। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রতিকৃতি তার চাইতে ভিন্ন। তিনি যেন তাঁর মুখে তখনকার সমাজের আদর্শ ও মূল্যবোধকে ব্যঙ্গ করেছেন, প্রশ্ন করেছেন, নাড়িয়ে দিতে চাইছেন। যেমন কালি-কলমে কখনো যেন তিনি মুখটিকে ঢেকে দিতে চান ছায়াপাতে। কখনো তীব্রভাবে তিনি তাকিয়ে রয়েছেন যে দর্শক ছবি দেখেছেন তাঁর দিকে।

এমনই 'ডার্ক হিউমারের' সাক্ষ্য পাওয়া যায় ১৯৩৪-এর করা কয়েকটা আত্মপ্রতিকৃতিতে। ১৯৩৪-এর মে মাসে বিশ্বভারতী নিউজ রবীন্দ্রনাথের ওপর একটা 'বিশেষ জন্মদিন' সংখ্যা ছাপায় যার প্রচ্ছদে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রতিকৃতির ফটোগ্রাফ ছিল। ওইফটোগ্রাফটার ওপর রবীন্দ্রনাথ বিচিত্রভাবে আবার নূতন করে আত্মপ্রতিকৃতি করেন। কালিও রঙে তিনি ফটোগ্রাফের সৌম্যদর্শন রবীন্দ্রনাথকে যেন এক উন্মাদ দিশা দেন কখনো, কখনো এমনভবে রং ও কালি চালান যে দাড়ি যেন আর থাকে না, যেন shaved রবীন্দ্রনাথের মুখ, আবার কখনো সেই ফটোগ্রাফ বদলে যায় গোলাকৃতিক নারীমুখে। নিজের ফটোগ্রাফিক reproduction -গুলি নিয়ে এমন বিচিত্র বৈপরীত্য তিনি নিজেই নির্মাণ করলেন। তাঁর মনের গহনে কত যে রূপান্তর অনবরত ঘটত তার প্রমাণ এই বিচিত্র কাজগুলি। পিকাসোও একবার তাঁর প্রতিকৃতির ফটোগ্রাফে রং চালিয়ে নিজেকে নিয়ে গ্রিক প্রাচীন পুরুষের অতিশয়োক্তি তৈরি করেছিলেন। সে কারনেই যে অসংখ্য শিল্পীরা রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিকে যেভাবে এঁকেছেন, মূর্তি গড়েছেন তার চাইতে আলাদাহয়েছেন তিনি। এমনকী একটা ছবিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোনো শিষ্যা মহিলা যিনি নতজানু হয়ে রয়েছেন তাঁকে আশীর্বাদ দিচ্ছেন হাত মাথায় ঠেকিয়ে যেমন ভারতীয় সাধুরা করেন। নিশ্চয়ই 'গুরুদেব' হিসেবে সম্বোধিত হতেন তাতেও তিনি কৌতুক বোধ করে থাকবেন। আবার এমন আত্মপ্রতিকৃতিও রয়েছে যেখানে তিনি solitary, এককভাবে রয়েছেন। কোনো কোনো ছবিতে রয়েছে ট্র্যাজিক অভিব্যক্তি। ঠাকুর পরিবারের বৈশিষ্ট্যই এই যে, পরিবারের এতজন নারী - পুরুষ শিল্পচর্চায় ব্যস্ত ছিলেন কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা। এর আগে পর্যন্ত ভারতীয় শিল্প ইতিহাসে এক একটা পরিবার এই ধরণের চিত্ররীতিতে ব্যস্ত থাকতেন। সেদিক থেকে ঠাকুর পরিবারই প্রথম ভারতীয় শিল্পপরম্পরাকে অতিক্রম করেছেন।

।।চার।।

শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ থেকে নন্দলাল, বিনোদবিহারী, রামকিঙ্কর প্রত্যেকেই ল্যা' স্কেপ এঁকেছেন অসংখ্য। তাঁদের আরেকটা সাধারণ বিষয় ছিল ফুল, যদিও রামকিঙ্করের ছবিতে শুধুমাত্র ফুল তেমন নেই। এবং এই যে ল্যা' স্কেপ তাঁরা এঁকেছেন তা-ও অনেকাংশেই বীরভূমের প্রত্যন্ত অঞ্চলের। তাদের আঁকা ল্যা' স্কেপের তুলনা, প্রতিতুলনাও হতে পারে। কিন্তু এই চারজনের ভেতর রবীন্দ্রনাথের fantasy নির্মাণের ইচ্ছা, বিচিত্র figure-কে রঙের টইটম্বুরতায় আঁকার ইচ্ছা যেন বেশি। যেমন রবীন্দ্রনাথ ক্রমাগত caricature করেন, আঁকেন। মুখে বিকৃতি আঁকতে আঁকতে কখনো সেই থেকে মুখোসেও পৌঁছে যান তিনি। ঠাকুর পরিবারের গগনেন্দ্রনাথ তো বটেই, এমনকী কখনো কখনো অবনীন্দ্রনাথও কেরিকেচার আঁকতেন। গগনেন্দ্রনাথ তাঁর আঁকা কেরিকেচারের একটা আর্থ-সামাজিক -রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও যোগ করতেন। অবনীন্দ্রনাথেও খুব সূক্ষ্মভাবে কখনো কখনো তা হত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই কেরিকেচার থেকেই জেগে উঠত অবচেতনের এমন সব বিচিত্রপশু, পাখি, নারী, পুরুষ যা আর বাস্তবের বিষয় নয়। তা কৌতুকের যেমন, বিস্ময়েরও তেমনই। ফলে গগনেন্দ্রনাথের কেরিকেচারে স্যাটায়ার যেমনভাবে রয়েছে, রবীন্দ্রনাথের রয়েছে হিউমার।

সাধারণত রবীন্দ্রনাথের potraits-গুলি, অনেক সময়ই এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকা নারী - পুরুষ, এমনকী তাঁর কয়েকটি আত্মপ্রতিকৃতিও স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। যে ছবিটি দেখবেন সেই দর্শকের দিকে যেন এঁরা তাকিয়ে রয়েছেন। এই এক দৃষ্টে যাঁরা তাকিয়ে থাকেন, যাঁরা চোখের পলক পড়ে না, এই দৃষ্টিপাত সমাজ জীবনে এক ধরনের intrusion-এর কাজ করে, যেন সমাজের অন্য কারও ধারাবাহিকতায় ধাক্কা দেওয়া হয়েছে এই অপলক দৃষ্টিপাতে। রবীন্দ্রনাথের ছবিতে কখনো যে নগ্নতা এসেছে তা-ও এসেছেব্যবহৃত জীবনের code ভাঙার তাগিদেই। আবার এইভাবে অপলক একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার ভেতর এক ধরনের অসহায়তাও লক্ষ করা যায়, যেন প্রোর্ট্রেটগুলি কিছু বলতে চাইছে। সাধারণত কেরিকেচারগুলি বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের ছবিতে যে - নারীরা এসেছেন তাঁরা তাঁর পরিচিত বা তাঁর অভিজাত পরিবারের মতোই সবাই। লম্বা গলা, টান হাত, সুন্দর চোখ, মুখ, চুল, নিয়েই নির্মাণ করতে চাইতেন তিনি নারীর প্রতিকৃতি। কিন্তু কখনো সেই ফিগারগুলিই আর distortion-এর ভেতর গিয়ে কেমন রহস্যময় হয়ে উঠত। তারা যুক্ত হয়ে যেত চারপাশের অন্ধকার প্রকৃতির সঙ্গে। ফ্যান্টাসি ও মিথ আঁকতে গিয়েও তিনি কোনো নির্দিষ্ট মিথে থেমে থামেননি। বরং এমন মিথ তিনি নিজেই নির্মাণ করেছেন যা ব্যক্তিগত ও অর্থহীন। তাঁর ফ্যান্টাসির এমনতরো দিক যেখানে কোনো

সরলরৈখিক আখ্যান পাওয়া যায় না, যা অর্থের সীমাবদ্ধকে অতিক্রম করে তা বার বার এঁকেছেন তিনি। Elitist নারীমুখ আঁকলেও তাতে ধনের গৌরব প্রকাশের কোনো চেষ্টা করেননি তিনি, কোনো আলাদা কৃত্রিমতা তৈরি হয়নি অযথা ডেকরেশনকে গুরুত্ব দিয়ে। মনে হয় কখনো কখনো যেন আঁকা প্রকৃতিই গভীরভাবে দেখছেন শিল্পীকে। নিরীক্ষিত হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁরই প্রতিকৃতি দ্বারা।

ঋজু, একরোখা প্রতিকৃতি আঁকবার দিকে ঝোঁক ছিল রবীন্দ্রনাথের। তেমন প্রোফাইলও এঁকেছেন অসংখ্য। তাতেও কেরিকেচার, গাম্ভীর্য যেমন মিশে গেছে তেমন প্রার্থনারত, নতজানু, চোখ নামিয়ে নেওয়া যে প্রতিকৃতিগুলি তারও যেন কোনো অজানা ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে চলেছে। তাই প্রথম দিকের কাজে যে primitive form, সুমাত্রা - জাভা ঘোরার অভিজ্ঞতা ও বিচিত্র সব অলংকরণ প্রাধান্য পেয়েছে তা আরও ঋজু হয়ে একান্ত ব্যক্তিগত from-এ জেগে উঠেছিল পরের দিকের কাজে। তিনি still life-ও যখন আঁকতেন, কোনো ফুলদানি বা জলের জগ, তাতেও ছন্দের মোড়কে মুড়ে প্রকাশ করতেন। কিন্তু ওই ডেকরেশন এমন organic হয়ে প্রকাশ পেত যে, রবীন্দ্রনাথের মানসিক পূর্ণতার একটা সাক্ষ্য থাকে তাতে। তিনি যে বলতেন, তাঁর শিক্ষা হল ছন্দ জানা শিক্ষা, তা জীবন থেকে কবিতা হয়ে ছবি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর কিছু ছবিতে ফিগার ও চারপাশের প্রকৃতি ও পরিবেশ এমনভাবে উপস্থিত হয়েছে যে, তার ভেতর কোনো সহজ আখ্যানমূলক বিবৃতি ধারা খুঁজে পাওয়া যায় না, ছবি যেন তা ছাড়িয়েগিয়ে এক মরমি অনুভবে পৌঁছেছে। বাস্তব জগতের সঙ্গে একটা সম্পর্ক রেখেও তা কখনো কখনো মৌল অনুভূতিময় পরাবাস্তবতার ধারণা এনে দেয়।

রবীন্দ্রনাথের নারীমুখগুলির ভিতর বা কখনো তার স্বপ্রকৃতিতেও প্রত্যক্ষ করা যায় দুঃখিত, বিষণ্ণ এবং নিঃসঙ্গতার অনুভব। এবং তাতে অনেকাংশেই নতুন মাত্রা যোগ করেছে চারিদিকের অন্ধকার। ফলে উদ্‌বেগ, উৎকণ্ঠার প্রকাশ হয়। দৃশ্য জগতের বহু স্তর ছুঁয়ে যায় রবীন্দ্রনাথের ছবি। আর বার বার কলমের আঁচড়ে বা পেনসিলের দাগে এমন ডেলিকেসি নির্মাণ হয় যা হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ ২৪ জুন ১৯৩০-এ নির্মলকুমারী মহালনবিশকে লিখেছিলেন, ছবি হল তাঁর 'অস্ত গমনকালের শেষ বর্ণবিন্যাস'। তাঁর ল্যান্ডস্কেপগুলিতে বোলপুর, বীরভূমেরও প্রকৃতি, এমনকী পূর্বপল্লী, খোয়াই-এর নিঃসঙ্গতা, ঝুঁকে পড়া গাছের মর্মর এবং তাইতে নেমে আসা অন্ধ রাত্রির অনুভব রয়েছে। কখনো বারান্দার রেলিঙে দাঁড়িয়ে হয়তো প্রত্যক্ষ করেছেন, তেমনভাবেই এঁকেছেন তিনি। তাতে আর কোনো ফিগারের উপস্থিতি থাকেনি, কিন্তু বারান্দা, রেলিং যেন কোনো উপস্থিতির সাক্ষ্য দিচ্ছে। এই যে ছায়া ঘনিয়ে ওঠে প্রান্তর, বনে, রবীন্দ্রনাথের ল্যান্ডস্কেপ, তাতে এক গভীরতর মানবিক উপলব্ধি থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ল্যান্ডস্কেপ আলো - অন্ধকারের horizon -এ গিয়ে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ল্যান্ডস্কেপ রয়েছে যা এক অন্য শিহরণ জাগায়। কেননা এমনভাবে এঁকেছেন তিনি সে দৃশ্য যেন তিনি তাতে বিলীন হয়ে গিয়েছেন বা তেমনই একটা গূঢ় ইচ্ছে থেকেই এঁকেছেন। যেসব রং সাধারণত তিনি ব্যবহার করতেন তা হল লেবু, হলুদ, গোলাপি, কোবাল্ট নীল, কালচে ধূসর, লাল, কালো) তা আশ্চর্যভাবে ছড়িয়ে দিয়েছেন ল্যান্ডস্কেপ। এবং রং তিনি কখনোই সাদৃশ্য মিলিয়ে আঁকেননি কিন্তু আশ্চর্য tone তৈরি করতে পেরেছেন তাঁর সকল ছবিতে। রঙের ফারাক থেকে যে আলো - অন্ধকার তৈরি হয়েছে তার ঘনত্ব রয়েছে। তিনি কালি,স্বচ্ছ - অস্বচ্ছ জলরং, ক্রেয়ন অবলীলায় ছবিতে ব্যবহার করেছেন। এই যে আধুনিক ছবিতে mixed medi এখন চালু প্রক্রিয়া তার শুরু ভারতবর্ষে অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের ছবিতে।

এ কথা স্পষ্ট যে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই কোনো শিল্পসৃষ্টির তাগিদে- তা সাহিত্য, ছবি, গান যাই হোক না কেন, অদ্ভুত এক আবেগজনিত ঘোরের ভেতর ঢুকে পড়তেন, যা তাঁর পক্ষে ছিল realm of fascination। অন্তত গভীরতা পরতে পরতে ওই fascination-এর ভেতর যোগ হয়ে যেত যেখানে বস্তুগুলি মিশে গিয়ে তাদের প্রাত্যহিক অর্থকে সরিয়ে ফেলে সম্পূর্ণ নতুন হয়ে আত্মপ্রকাশ করত। এবং রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ল্যান্ড স্কেপের তাই এমন আলো জগৎ পারাবারের ভেতর, অন্ধকারের ভেতর সৃষ্টি হয়েছে যা গভীর অনুভব করে বুঝে নিতে হয়। এমন অপার্থিব আলো যা কেবলই দেখে যাই আমরা, দেখা আর শেষ হয় না, ডুবে যাওয়া চলে। রবীন্দ্রনাথ দিলীপকুমার রায়কে ২ জুন ১৯৩৩-এর চিঠিতে লিখেওছিলেন এমন স্বীকারোক্তি 'আমি ছবি আঁকি দৈববশে) এতে আমার পুরুষকার কিছুই নেই।' বা ২৪ আশ্বিন ১৩৩৮-এ সরসীলাল সরকারকে লেখা 'উপলব্ধি ও ভাষা এই দুইয়ের যোগে জিনিয়াস্‌। ...ভাষা কেবল শব্দের ভাষা নয়, সঙ্কেতের ভাষা, রেখার ভাষা...'। তবুও যাঁদের isionary শিল্পী বলা হয় যেমন উইলিয়াম ব্লেক, উনিশ শতকের ফরাসি শিল্পী রেদোন্‌, রুঁয়ো) তাঁদের থেকেস্বতন্ত্র তিনি। তিনি প্রজ্ঞাকে প্রকাশ করতে গিয়ে কোনো ধর্মীয় মিথ বা উপকাহিনির আশ্রয় বিশেষ মুহূর্তে তিনি ওই দৈবের বশ অনুভব করেন, একটানা করেননি কোনোদিন। অর্থাৎ তিনি 'দৈববশ'কে কোনো ফ্যাশন statement-এ পরিণত করেননি। চেতন - অবচেতনের মিলিত ক্রিয়ার ফলশ্রুতিই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় শিল্পকর্ম।

।। পাঁচ ।।

আবার ২৪ জুন ১৯৩০ এ নির্মলকুমারী মহালনবিশকে লেখা চিঠিতে ফেরা যাক। কেননা ওই চিঠিতে তিনি নন্দনতত্ত্বের ওপর এমন আলোকপাত করেছেন যা খুঁটিয়ে পড়া উচিত। তিনি লিখেছেন, 'যারা সমঝদার তারা যখন একটা কিছুকে ভালো বলে বা মন্দ বলে তার কারণ হচ্ছে সেটা তাদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার অনুকূল অথবা প্রতিকূল। কিন্তু আমার ছবিগুলিকে তারা কোন পর্বভু ক্ত করতে পারছে না। তাদের মনে ভালো মন্দর যে আদর্শ আছে এগুলো তার সদৃশও নয় বিসদৃশও নয়, অসদৃশ। অর্থাৎ সনাতন আলেখ্যরীতির সঙ্গে মিলছে না অথচ চিরন্তন আলেখ্যতত্ত্বের সঙ্গে বিরোধ বাধছে না।'

যে-কোনো মহৎ শিল্পী যখন শিল্পকলায় নূতন কিছু করেন তাঁর এমন অনুভব হয়। কেননা যখনই কোনো ছবি বা শিল্প নির্মাণহয় প্রচলিত ধারাকে ভেঙে তার আগাম ভবিষ্যদ্‌বাণী দেওয়া সম্ভব নয়। নতুন কিছুর সৃষ্টি হয় যেন বজ্রপাতের মতো। পিকাসো যখন 'women of Avignon' ১৯০৭-এ এঁকেছিলেন, তখন তিনি হঠাৎ উৎসাহিত হয়েছিলেন আফ্রিকান মাস্কে, সেঁজানের ছবির গঠনগত সংবেদনে, এবং সর্বোপরি এক আতঙ্কজনক অভিব্যক্তিতে যা একটা masterpiece অথচ তাঁর কোনো শিল্প - ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্‌বাণী ছিল না। এ ক্ষেত্রে শিল্পের ইতিহাস এমনভাবে কোনো ব্যক্তির ভেতর নতুন threshold-এ পৌঁয়োয় তা যেন আগের অজানাই ছিল। রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ছবি আঁকতে উদ্যোগী হয়েছিলেন তা-এ প্রায় তেমন। ছবি দেখার অভিজ্ঞতা, দেশ-বিদেশের মিউজিয়াম ঘোরা এবং কয়েকজন শিল্পীর সঙ্গে পরিচয় এবং অনেক আগে অতি সামান্য তালিম নেওয়া) তাইতে ভর করে অত বয়সে তিনি এমনভাবে এত মনোযোগে আঁকতে উদ্যোগী হয়েছিলেন কেননা তাঁর নন্দবোধের সমকালীনতা তাঁকে আশ্চর্য ব্যতিক্রম করে তুলেছিল। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছিলেন নির্মলকুমারীকে তেমনই লিখেছিলেন আজকের একজন ফরাসি উপস্থাপনা (installation) শিল্পী ক্রিশ্চিয়ান বোলতানস্কি। তিনি 'Monument to an Unknown Person' প্রবন্ধ লিখেছেন,

> For me the most interesting period is the one in which the spectators are not yet aware that what they are experiencing is art. During the moment – which is relatively short – you can engage spectators by presenting them with something that is art without saying that it is art. But very soon they realize that it is art, complacency sets in…

আশ্চর্য হতে হয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আজকের এক ফরাসি আঁভা গার্ড শিল্পীর মানসিক যোগাযোগ দেখে। রবীন্দ্রনাথের নান্দনিক ভাবনায় এত মৌলিক অনুভব ছিল বলেই এমন সম্ভব!

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছবির সঙ্গে আন্তোনিন আর্তোর কাজের একটা তুলনামূলক আলোচনা হতে পারে। আর্তোর আঁকা প্রতিকৃতিগুলিও ছিল নার্ভাস উপস্থাপনা ও প্রায় frontal। দুজনেই আশ্চর্য রকমের সংবেদনশীল তাদের অস্থির, ভাঙা - ভাঙা পেনসিল বা কালির লাইনে। এবং আর্তো যখন লিখছেন, 'I started to do large colored drawings… These are written drawings, with senses inserted in the forms so as to precipitate them' তখন বুঝতে অসুবিধে হয় না, রবীন্দ্রনাথের text-image-গুলির ম্যাজিকের সঙ্গে যেন একটা সাযুজ্য তৈরি হচ্ছে আর্তোর কাজের। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ওই কাজগুলি করেছেন আর্তোর কাজের দু-দশক আগে। যদিও রবীন্দ্রনাথের ছবিতে ছন্দ, সামগ্রিকতা ও বৈচিত্র্য অনেক বেশি আর্তোর চাইতে, কিন্তু আর্তোর অঙ্কন দক্ষতা রবীন্দ্রনাথের চাইতে বেশি। তুলনায় রবীন্দ্রনাথের রয়েছে এক বিচিত্র ব্যক্তিগত নাইভ্‌ - গুণ। আর্তোকে কাজও করতে হয়েছে রডেজে পাগলা গারদে থেকে। লজিককে ছাপিয়ে এত প্রাচীনতার সঙ্গে মুখোমুখি হতে পারতেন তিনি যা অস্তিত্বের টানাপোড়েন নয় কেবল অস্তিত্বের পুনর্নির্মাণও। দুজনেই শিল্প নির্মাণে সম্ভাবনা, চকিত ভাবনা, বিচিত্র ঘটনা, স্বতোৎসারিত হওয়ার দিকে জোর দেন। দুজনেই যেন খুলে ফেলতে চান মনের যাবতীয় ঢাকনা যাতে সারা বিশ্বে একটা গতিবেগ আসে। ছবির রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লিখতে গিয়ে কে. জি. সুব্রমনিয়ম তাঁরবড় Creative Circuit (১৯৯২) বইতে লিখেছিলেন, 'Rabindranath.. threw his work open to those visitations, manic, traumatic or nostalgic, that tramped the corridors of his memory.' আর এই ম্যানিক, ট্রামেটিকে ঘুরে বেড়িয়েছে আর্তোর অস্থির ছবিগুলিও। দুজনেই সাধারণ ন্যারেশন ডিঙিয়ে প্রবেশ করেন এক অজানা অচেতনে যেখানে লেখার interjectio বিস্ময়ের ভেতর আর্তনাদ ঘটায়, কথককে দেয় এক পরা অস্তিত্ব।

তবে রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য মহিলার প্রতিকৃতি যেমন নরম অথচ অভিজাত, ভঙ্গুর কিন্তু বেদনায় আর্ত, দূর এবং কাছে যেখানে মিলেমিশে একাকার, আর্তোর কাজে তেমন হয়নি। সে

প্রতিকৃতির অভিব্যক্তি অসহায়তা ও কাঠিন্যর, এরা যেন furious জীবনের প্রতিনিধি। কিন্তু দুজনেই মানুষের মুখে খুঁজে পান আবেগমর্মর ফিংসংস্ককে, রহস্যময়তাকে, যা আবিস্কার করা প্রতিভার কাজ।

রবীন্দ্রনাথের আরেকটা জোরের জায়গা যা আর্তোর নেই তা হল কেরিকেচারের প্রতি আকর্ষণ। তিনি ক্রমাগতই এমন কেরিকেচার আঁকছেন তা যেন বাস্তবতাকেও একটা নির্মম হাস্যকৌতুকে পরিণত করেছে। কেননা জাতীয়তাবাদী দিনগুলিতেও রবীন্দ্রনাথযে কতটা বিচ্ছিন্ন হতে পারতেন ঘটনাক্রম থেকে এবং ফিরেও আসতে ঘটনাচক্রে তার সাক্ষ্য থেকে যায় এই কেরিকেচারে।

এখানে এ-ও বলা যায় একজন শিল্পী উত্তরোত্তর বদলে গিয়ে নিজের পরিচিত তৈরি করেন, আমরা তাকে কীভাবে দেখে বা ব্যাখ্যা করে চলেছি তা-ও এই আত্মনির্মাণের কাহিনি থেকে বিচ্ছেদ্য নয়। শিল্পী যে অস্থির স্মৃতি রেখে যান তা যেন রঙিন অথচ আবিল একটা ফাঁক, যেখানে এসে জড়ো হয় আমাদের শিল্পীকে নিয়ে ভাবনা ও ব্যাখ্যা। প্রাথমিকভাবে রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে বিরুদ্ধতাহলেও ভারতীয় শিল্পীরা বরাবরই শ্রদ্ধা করেছেন তাঁকে - যামিনী রায়, নন্দলাল, বিনোদবিহারী হয়ে গাইটোে' হুসেন, মানি সুব্রমনিয়ম, যোগেন চৌধুরি ইত্যাদি পর্যন্ত। বরং ৫০-এর দশকের বাংলাভাষী লেখকদের একাংশ তাঁর কবিতা নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছিলেন। নন্দলাল, অবনীন্দ্রনাথকে অভিযোগ শুনতে হয়েছে তাঁদের ছবিতে পুরাণকল্প, হিন্দুত্ববাদ ইত্যাদির জন্য। এসবই কেবল ভাগ্যের পরিহাসের মতো। আর রবীন্দ্রনাথের কেরিকেচারে তো রয়েই গিয়েছে সমাজের বাইরের ভাঁড়া, যাদের চোখ যেন সময়ের কৌতুকের উত্তরে ঝিলিক দেয়। সময় যেন পর্দার মতো যা বার বার নিজে থেকেই সরে গিয়ে কিছু সত্যকে প্রকাশ করে দেয়, একবারে সব সত্য প্রকাশিত না হলেও। রবীন্দ্রনাথের যে অসংখ্য পরিচয় - চিহ্ন থাকে তার সাহিত্যে, ছবিতে, গানে, দার্শনিক ভাবনায়, কাজে তাও কখনো একটার সঙ্গে আরেকটি মিশে থাকে। সেই পরিচয় - চিহ্নগুলি পৃথক থাকে সাজানো নেই।

রবীন্দ্রনাথের ক্রেয়ন, পেনসিল, প্যাস্টেল ঘষে ঘষে আঁকবার অভিপ্রায় ছিল বারবার। তাতে তিনি কালি দিয়েও ভরিয়ে দিতেন কিছু অংশ। অথবা বার বার কলমের দাগ কেটেও যে texture তৈরি করতেন তাতেও অন্ধকার সৃষ্টি হয়ে যেত। ঘন অন্ধকারের ভেতর খরদৃষ্টি নিয়ে ফিগারগুলি (বিশেষত নারী) তাকিয়ে থাকে সরাসরি। আধুনিক বাংলা কবিতায় যেমন পশ্চিমের আধুনিকতায়ও তেমন অন্ধকারের একটা দার্শনিক দ্যোতনা আছে, এবং তেমনই হয়ে দাঁড়িয়েছে রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য ছবি। অনেক সময় কালো রং ছড়িয়ে দিয়েও এমনভাবে সাদা রেখা বার করে আনতেন তিনি যে, মনে হয় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কোনো বাড়ির ভেতর থেকে আলো জ্বলতে দেখছি। বাতিদনা বা প্রদীপ তাঁর অনেক ছবিতেই রয়েছে। তা হয়েতো রামকিঙ্করকে উদ্দীপ্ত করেছিল শান্তিনিকেতনের উপাসনা মন্দিরের চত্বরে রাখা 'বাতিদান' ভাস্কর্য সৃষ্টি করতে। প্রদীপের আলো ঘিরে অন্ধকার যেমন ছড়িয়ে যায়, রবীন্দ্রনাথের ছবিতেতেমন আলো - অন্ধকার দেখা যায়। অন্ধকার ঘুরে বেড়ায় আলোর সরল বা বর্তুল রেখা। আবার সাদা কাগজে কালো দাগের কাজ তো রয়েইছে।

আর রয়েছে ছবির পর ছবিতে রবীন্দ্রনাথের স্থাপত্যের প্রতি আকর্ষণ। এমন ভাবে ফিগার এঁকেছেন তা যেন বিচিত্র স্থাপত্যের ভেতর দিয়ে গড়ে উঠেছে। নানান খোপের ঘর, ঘুলঘুলি স্বতোৎসারিতে মতো নির্মিত হয়ে গিয়েছে ফিগার বেয়ে। এমন গঠন রয়েছে এই ছবিগুলিতে বা এণন মায়াবী অবাস্তবতা যা কল্পনাকে উসকে দেয়। এই যে বিচিত্র ঘরগুলি নিয়ে একটা বাড়ি তৈরি হল যা একটা মানুষও, বা তার স্থাপত্য, নকসা থেকে জাপানি বাড়ির ডিজাইন, এমনকী গ্রামের খড়ের বাড়ি মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় নানান কাজে। ছবির গভীরতা ও চঞ্চলতা - এই দুইকে রবীন্দ্রনাথ এমন অদ্ভুতভাবে ছুঁয়ে দিতেন। আর্ট নুভো, প্রতীকী, অভিজাত, naturalistic, আধুনিক, উত্তর আধুনিক এমন নানান নান্দনিক কোটিতে তাঁর ছবির অনুরণন ধরতে পারা সম্ভব। তা কাউকে পশ্চিমের অভিব্যক্তিবাদকে (Expressionism) মনে পড়ায়, তো কাউকে primtivism; আবার হালে কেউ কেউ আর্তো, উত্তর আধুনিকতার কথা তুলেছেন (যেমন এই প্রবন্ধ)। সুমাত্রা, জাভা বা থাইল্যান্ডে র পুতুল নাচের প্রসঙ্গও এসেছে তাঁর ছবির আলোচনায়।

তবু বছরের পর বছর এমনকী দশকের পর দশক রবীন্দ্রনাথের ছবির একটা প্রামাণ্য প্রদর্শনী হয় না, একটা ভালো ক্যাটালগ প্রকাশিত হয় না এ দেশে। তাঁর নোবেল পুরস্কারের মেডেল যখন চুরি গেল তখন সংবাদ মাধ্যম যেমন তৎপর হয়ে খবর ছেপেছে তার দশমাংশ তৎপরতা ব্যয় হয় না একটা উপযুক্ত প্রদর্শনীর জন্য তাঁর নিজের শহরেও। রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে কিছু বই নিশ্চয়ই রয়েছে, কিন্তু আরও বৃহৎ ও পূর্ণভাবে তা হতে পারে। যেমন রবীন্দ্রনাথের প্রায় দু-হাজার আঁকা ছবির ভেতর নির্বাচিত বড়জোর শ-দুয়েক ছবিই কেবল প্রদর্শিত হয় দিল্লির ন্যাশানাল আর্ট গ্যালারি থেকে কলকাতার আকাডেমি অব ফাইন আর্টসে। প্রয়োজন রয়েছে ওই দু-হাজার ছবিরই সঠিক নির্বাচন ও কিউরেশন পূর্ণাঙ্গভাবে হওয়ার। তেমন সমস্ত শিল্পকর্মের ক্যাটালগও প্রকাশ করা জরুরি।

বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনের সংগ্রহেরও সম্পূর্ণ ধারণা কোনো দর্শকের কাছে নেই। এ-ও শোনা যায়, যে, রবীন্দ্রনাথের কিছু এরটিক ছবি রয়েছে যা প্রদর্শিত হয়নি। শোনা কথা বলেই তা যেমন বিশ্বাসযোগ্য নয় তেমন অবিশ্বাসযোগ্যও নয়, দরকার তার পূর্ণআকাডেমিক অধ্যয়ন। কোনো সেন্সরশিপ যদি কোথাও হয়ে থাকে তা অবিলম্বে উঠে যাওয়া দরকার। এ কথা সামগ্রিকভাবেই ঠাকুরপরিবারের শিল্পীদের জন্য সত্য, তা তিনি অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, সুনয়নী দেবী, যে-ই হোন না কেন। তাঁদের কাজ হয় কোনো বিচিত্র কমিটির পাল্লায় পড়েছে নয় কোনো অফিসিয়াল ও ব্যক্তির খেয়ালের শিকার হয়েছে। না তাঁদের কাজের ক্যাটালগ রয়েছে, না প্রতিনিধিত্বমূলক প্রদর্শনী। ফলে দর্শকের দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়নের সুযোগ নেই।

রবীন্দ্রনাথ কেবল জিনিয়াস নন, অবিশ্বাস্য রকমের সৃষ্টিশীলতা, এমনকী বিচিত্র স্ববিরোধিতা এ-সব নিয়েই তিনি। এবং প্রগাঢ় অধ্যয়নের পরও তিনি ফুরোবার পাত্র নন। সৃষ্টির নতুন নতুন দিক নিয়ে জেগে ওঠেন না কেবল, আমাদের বৌদ্ধিক স্থবিরতাকে প্রায়শই প্রবল ঝাঁকুনি দেন সেই রবীন্দ্রনাথই।

রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠ শিশুশিক্ষণ গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত। 'প্রাইমার' -এর বৈশিষ্ট্য মেনে গ্রন্থদ্বয়ে (প্রথম ভাগ/ দ্বিতীয় ভাগ) গদ্য পাঠের বিবর্তনে এর শিশু - শিক্ষার অংশ বর্তমান। শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত গদ্যপাঠের সঙ্গে সংযুক্ত আছে শিশুমনের কল্পনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এর স্বপ্নময় কবিতাগুলি।

সহজ পাঠ-এর গদ্য এবং বেশ কিছু কবিতায় রবীন্দ্রনাথ পাঠের নেপথ্যে সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের রূপরেখাটিকে ইঙ্গিত করেছেন। লক্ষ করলে দেখা যাবে সহজ পাঠ প্রথম ভাগ এবং দ্বিতীয় ভাগ জুড়ে ভিড় করে আছে 'ওরা' কোথাও কথকের বাড়ির পরিচারক, পরিচারিকা কোথাও বা খেটে খাওয়া প্রান্তিক বর্গের।

বর্ণ পরিচয় পর্বে 'ক খ গ ঘ গান গেয়ে/ জেলে ডিঙ্গি চলে বেয়ে' -এখানে ক, খ-এর দল তো নিঃসন্দেহে জেলের দল, যারা বাড়িঘর ছেড়ে উজান বেয়ে চলেছে মাছের সন্ধানে। ক্লান্তি ভুলতে গানও গেয়ে চলেছে অবিরত। 'চ ছ জ ঝ দলে দলে/ বোঝা নিয়ে হাটে চলে'- অন্ত্যমিলে আবহমানকালের হাটুরের দলকে ইঙ্গিত করে আর তাকে বাঙ্ময় করে তোলে নন্দলাল বসুর আঁকা সারি সারি তালগাছের মাথায় বোঝা নিয়ে হাট থেকে ফেরে না, 'হাটে চলে'। তাদের হাটে যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য যে জিনিসপত্র বেচা, তা স্পষ্ট ঠ -রে দলও নিম্নবর্গীয় শ্রেণির প্রতিনিধি, এরা ঢাকি ঢুলি সম্প্রদায়। অন্যের পুজোপার্বণে ঢাকে ঢোলে কাঠি পড়লে তাদের অন্নসংস্থান। প ফ -এর দল চাষির খেতখামারে ঢাকে কাজ করা কুলি - কামিনের দল। যারা 'সারাদিন ধান কাটে'। ধান কাটা শেষ হলে পরমাঠের ফসল খামারে বা বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য আছে 'ম' -এর মতো অনলস গাড়োয়ান।

বর্ণ পরিচয়ের পর সহজ পাঠ প্রথম ভাগের প্রথম পাঠের কবিতায় ওদের সাধারণ জীবনের ছবি আছে এক - একটি ছন্দোবন্ধে। 'খুদিরাম / পাড়ে জাম' অংশে জাম পাড়া কি নিছক খাবারের কারণে, না একটি খুদিরামের ক্ষুদে জীবিকা? 'মধু রায়/ খেয়া বায়' অংশে স্পষ্ট যে, মধু রায়ের খেয়া পারাপারের পারানিই তার উপার্জন। এর পরের অংশে 'জয়নাল / ধরে হাল' এই জয়নাল কি মধুর দোসর, খেয়া বেয়ে যাওয়ার সমান্তরালে সে হাল ধরে থাকে। 'অবিনাশ / কাটে ঘাস' -কার জন্য? তার বাড়ির গবাদি পশুর জন্য, না অন্যের গোয়ালে ঘাস জোগানো তার জীবিকা? অনুরূপভাবে 'হরিহর / বাঁধে ঘর' -কার জন্য? সে কি তার মাথা গোঁজার ঠাঁই নির্মাণ না সে 'ঘরামি' -অন্যের ঘর বেঁধে দেওয়াই তার কাজ। পাতু পালের চাল আনার নেপথ্যে যে - পরিশ্রম তা অজ্ঞাত। 'গুরুদাস/ করে চাষ' শ্লোকটি যেন শাশ্বত। সনাতন এক চাষির নির্বিকার ভাবে চাষ করে যাওয়ার দ্যোতক। এইভাবে সমগ্র পাঠ জুড়ে কবিতার কথক মাত্র দু-ছত্রের মেলবন্ধনে জীবন - জীবিকার এক জটিল চক্রের ছবি স্থাপন করেন।

'নাম তার মোতিবিল' অংশে দেখি 'ডিঙি চড়ে আসে চাষী কেটে লয় ধান/ বেলা গেলে গাঁয়ে ফেরে গেয়ে সারি গান' -এখানেও জীবিকার লড়াই। সারা দিনের ধান কাটা শেষে চাষি গাঁয়ে ফেরে, শ্রান্ত ও ক্লান্ত দেহ - মনে সে সারিগান গায়। আবার এই মোতিবিলে রাখালের ছেলে নিয়ত মোষকে সঙ্গী করে পার হয়, জেলে তার বাঁশ বাঁধা জাল দিয়ে মাছ ধরে।

প্রথম ভাগ - পঞ্চম পাঠে 'চুনীমালী কুয়ো থেকে জল তোলে আর ঘুঘু ডাকে ঘু ঘু' -অনুষঙ্গে শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'প্রকৃতির নিত্য আবর্তনের সঙ্গে জোড়বদ্ধ যাবে চুনি মালী, সেটাই সংগত ও স্বাভাবিক। আমরা এর আগেও দেখেছি এই মানুষগুলোকে একটু ভিন্নভাবে, সচ্ছল সংসারের পরিচারক - পরিচারিকার পরিচিতিতে। সহজ পাঠ - এর প্রথম ভাগের প্রথম গদ্য পাঠে রামের বাড়িতে পুজো প্রস্তুতি মনে আছে। '... গাড়ী গাড়ী আসে শাক, লাউ , আলু, কলা। ভারী আনে ঘড়া ঘড়া জল, মুটে আনে সরা, খুরি, কলাপাতা।' 'গাড়ী' শব্দদ্বিত্বে প্রাচুর্যের ছবি স্পষ্ট। সমান্তরালে ভারীর 'ঘড়া ঘড়া' জল বয়ে আনা যেন এরই বিপ্রতীপে বাঁধা। ভারী মুটেদের সঙ্গে ভোলা মালিও আছে, যে মালা নিয়ে ছোটে, পুজোর আয়োজনে যাতে কোনো বিলম্ব না হয়।

চতুর্থ পাঠ - এ বিনিপিসি আর অসুস্থ রাণীদিদি সম্ভবত সহজ পাঠ-এর নেপথ্যে থাকা শিশুটির আত্মীয়। 'বামি' নাম্নী নারীটি বোধ হয় পরিবারের পরিচারিকা গোত্রের কেউ। আর আছে বুড়ি দাসী, যারা অন্দরে মা-কাকিমাদের নিরন্তর সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, দীনুদের শখের পাখি পোষার পরিচর্যাও তাদের উপর ন্যস্ত থাকে। অন্যদিকে সমস্ত পাঠ -এ দেখি শৈল ভেলা চড়ে বৈঠা বেয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির কর্তার ফরমাশ 'ওরে কৈলাস দৈ চাই। ভালো ভৈষা দৈ আর কৈ মাছ।' নবম পাঠ-এ গৌরকে কর্তা আপ্যায়ন করেন। 'ওরে কৌলু দৌড়ে যা, চৌকি আন' নির্দেশ দানের মধ্য দিয়ে সহজ পাঠ - এর নেপথ্যে থাকা শিশুটির পরিবার পরিজনদের সঙ্গে পরিচারক - পরিচারিকারা নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। অন্দরমহলে মা - কাকিমাদের কষ্ট লাঘবে নিবেদিত বামি, বুড়ির দল আর বহির্বাটিতে কর্তার হুকুম পালনে অনুগত কৌলু-কৈলাসেরা।

সহজ পাঠ-এর দ্বিতীয় ভাগে কয়েকটি কবিতার নেপথ্যে সেই কল্পনাপ্রিয় শিশুটির উপস্থিতি ছাড়া সমগ্র গদ্য পাঠে এবং বেশ কিছু কবিতায় এক বয়স্কের কণ্ঠস্বর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়। সে স্বর - ক্ষেপণে আছে নির্দেশ, আদেশ, নানান ফরমাশ আর চটজলদি হুকুম পালনের তাড়া।

দ্বিতীয় ভাগের চতুর্থ পাঠে দেখি কথকের পাড়ার কাজ দেখতে আসবেন চন্দননগরের আনন্দবাবু। এই অতিথি আপ্যায়নে গৃহস্থের যে-তোড়জোড় তাতে স্বয়ং কর্তা বা কথকের প্রত্যক্ষ কোনো যোগ নেই, তিনি শুধু ফরমাশ দিয়েই ক্ষান্ত। গদ্য পাঠে দেখা যায় আনন্দবাবুর নিখুঁত আতিথ্যের দায়ভার ন্যস্ত হয়েছে ইন্দুর উপর, এ ছাড়াও রঙ্গ বেহারা, বিন্দুদের নানান কর্তব্যে নিয়োজিত করা হয়েছে। পরিশেষে আনন্দবাবুকে আনন্দদানের জন্য গানের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। নন্দী এবং জনৈক অন্ধ গায়ক সেখানে আহুত। এই বিবিধ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের আবার আদেশদানের জন্য কথকের চোখের নাগালে সদা সর্বদা উপস্থিত এক আজ্ঞবাহী। 'দেখো যেন নিন্দা না হয়। ইন্দুকে বলে দিয়ো। রঙ্গ বেহারাকে বোলো' প্রভৃতি নির্দেশ দানে কথকের অবস্থানটি স্পষ্ট।

সপ্তম পাঠে 'শ্রীশকে বোলো...যোগে যে পাঠ শুরু তা সমগ্র নির্দেশাত্মক। এখানে কথকের হুকুম জারি চরমে। বসন্তের দোকান থেকে খাস্তা কচুরি, অন্য এক দোকান থেকে পেস্তা বাদাম, বাজার থেকে আস্ত কাতলা মাছ, গুন্তি করে ত্রিশটা আলু' ...এইভাবে দীর্ঘফর্দ আওড়ে যাচ্ছেন কথক। শ্রীশকে সেই ফরমাশ পৌঁছে দেওয়ার জন্য বহাল আছে এক বার্তাবহ। পাঠের পরিশেষে ওই বার্তাবাহীর জন্যও কিছু কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেন পাঠের কথক। 'মনে রেখো কড়াই চাই, খুন্তি চাই, জলের পাত্র একটা নিয়ো'। অষ্টম পাঠেরকথকের কণ্ঠস্বরে কোনো হেরফের নেই। 'আপিসের ভাত এখনও হল না। উনানের আগুনটা উস্‌কিয়ে দাও। ঠাকুর আমার ঝোলে যেন লঙ্কা না দেয়। বঙ্কিমকে আমার খাতাটা আনতে বোলো'। রান্নার ঠাকুর, ভৃত্য বঙ্কিমের সঙ্গে কর্তা বা কথকের যোগস্থাপনে এখানেও কর্তার ছায়ানুসারী এক আজ্ঞাবাহী মজুত।

সহজ পাঠ দ্বিতীয় ভাগের দশম পাঠের পরিবেশটি বেশ গা ছম্‌ছমে এবং এখানে কথকের তিরিক্ষি মেজাজ। পূর্বোক্ত পাঠগুলিতে কথকের অগনন নির্দেশ দানের মধ্যেও ছিল মোলায়েম সুর, ফাই - ফরমাশ খেটে যাওয়ার মানুষগুলিকে সম্বোধনে ছিল শালীনতা, স্নিগ্ধতা, সর্বোপরি ওদের প্রতি ছিল দরদ। 'সপ্তম পাঠের দীর্ঘ ফরমান জারির ঠেলায় আজ্ঞাবাহী যখন শশব্যস্ত, তখন কথকের মৃদুজিজ্ঞাসা মিশ্রিত সাবধানবাণী 'অতো ব্যস্ত হয়েছ কেনো? আস্তে আস্তে চল। ক্লান্ত হয়ে পড়বে যে?' নবম পাঠে জনৈক বোষ্টমি গানগাইতে এসেছে। কথক বাড়ির অন্যান্য পরিজনদের উদ্দেশে বলছেন, 'ওকে নিষ্ঠুর হয়ে বাইরে রেখো না, বৃষ্টিতে ভিজে যাবে, কষ্টপাবে।' এ হেন অনুভূতিপ্রবণ দরদি মানুষের গলায় যখন শোনা যায়, 'বাঞ্ছাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দাও। বাঞ্ছা শীঘ্র আমার জন্য চা আনুক... রক্ষামণি থাক খুকুর কাছে... আর মন্টুকে বলো বারান্দা পরিস্কার করে দিক।' তখন সে নির্দেশে কঠোরতার দিক বড়ো হয়ে ওঠে। উল্লাসকে ধিক্কার দেওয়া, রক্ষামণিকে 'তুই' সম্বোধন, সর্বোপরি বাঞ্ছাকে ধাক্কা দিয়ে জাগানোর নির্মম নির্দেশ দানে কথকের অমানবিক দিকটি ফুটে ওঠে। কথকের অজস্র আজ্ঞাপনের বিপরীতে, তার অসংযত আচরণের বিপরীতে 'ওরা' বারবার নীরবে কাজ করে যায়, কোথাও কোনো টুঁ শব্দ নেই। দশম পাঠে একবার মাত্র উল্লাসের ভয় - মেশানো কণ্ঠস্বর ছাড়া কোথাও কোনো স্বর নেই।

সহজ পাঠ দ্বিতীয় ভাগের শেষ তিনটি (একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ) পাঠে বা 'গল্পে' 'ওরা' কোথাও ক্লান্ত, পথহারা শক্তিবাবুদের সেবক এবং পথনির্দেশকের ভূমিকা নেয়, কোথাও ডাকাতের কবল থেকে ডাক্তার বিশ্বম্ভরবাবুকে বাঁচানোর জন্য প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে বুক চিতিয়ে দাঁড়ায় শম্ভু, কোথাও বা সদগোপবংশীয় নিরপরাধ উদ্ধব মণ্ডল জমিদার কর্তৃক অন্যায় ভাবে অপমানিত হয়ে থম্ মেরে যায়।

শ্রেণি উন্নাসিকতার বেড়াজাল ভেঙে যদিও কাত্যায়নী ঠাকরুণ (ভূস্বামী দুর্লভ বাবু সম্পর্কিত পিসি) উদ্ধবের দরজায় এসে দাঁড়ান তাঁর কন্যা নিস্তারিণীকে নবজীবনের আশীর্বাদ জানতে, কিন্তু তা বলে জমিদার দুর্লভবাবুর সঙ্গে দূরত্ব ঘোচে না উদ্ধব মণ্ডলদের। একদিকে শক্তিবাবু, বিশ্বম্ভর ডাক্তার, দুর্লভ জমিদার, অন্যদিকে আক্রম, শম্ভু, উদ্ধব মণ্ডল। একদিকে অজস্র হুকুম, ফরমায়েশি অন্যদিকে নির্দেশ পালনের নিখুঁত প্রয়াস। যেমন কর্তার অগনণ আদেশের মুখে 'ওরা' নীরবে কাজ করে যাওয়ার জন্যই বিধি - প্রদত্ত। মনিবের মনোমতো কাজ, তার মনোরঞ্জনের জন্য যথাসম্ভব আয়োজনের সমান্তরালে তার নিরাপত্তার দায়ভারও 'ওরা' নীরবে নেয়। বিনিময়ে 'ওরা' এদের প্রাপ্য সম্মানটুকুও পায় না। কাত্যায়নী ঠাকরুণের মতো মহৎ প্রাণ বা জমিদার সঞ্জয় সেনের মতো মহানুভব দু-একজনকে বাদ দিলে উদ্ধবের দারিদ্র, কাঠুরিয়াকে প্রান্তিক নির্বাসন, অন্ধ গায়ক কুঞ্জবিহারীর অসহায়তা থেকে সবাই নিরাপদ দূরত্বেই থাকেন। শুধু ওরা কাজ

করে নীরবে।' ওদের কথা লিপিবদ্ধ হয় শিশুপাঠ্য কাহিনিতে। সহজ সরল গদ্য পাঠের মাঝে এসে দাঁড়ায় 'ওরা', হয়তো বা গদ্যকারের অজান্তেই।

'ওরা'র ভাবনাসূত্রটি শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোপাল রাখাল দ্বন্দ্ব সমাজ উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য (কলকাতা প্যাপিরাস, ১৯৯১) 'উপসংহার' অংশ থেকে গৃহীত।

১. সহজ পাঠ প্রথম ভাগের দ্বিতীয় আখ্যাপত্রে বলে দেওয়া আছে নন্দলাল বসু কর্তৃক চিত্রভূষিত এই বই বর্ণ পরিচয়ের পর পঠনীয় অর্থাৎ এই বই বর্ণ শেখার বই নয়। 'প্রাইমার' নিয়ম মেনে সহজপাঠ-এ সব বাংলা বর্ণের পরিচয় নেই। (যদিও সহজ সরল গদ্য ভাষা ং, ঃ, -র সুন্দর প্রয়োগ আছে)। বর্ণযোগে শব্দ নির্মাণের পর্বটিও এখানে অনুপস্থিত, তবু বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় - এর সমান্তরালে পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রথম শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য সহজ পাঠকে প্রাইমার হিসেবেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

২. স্বাভাবিক শিশুমাত্রই কমবেশি কল্পনাপ্রবণ। সহজপাঠ-ই শিশুর প্রথম শিক্ষা গ্রন্থ যেখানে সে কবিতার মেলবন্ধনে নিজস্ব কল্পনার জগৎকে ছুঁয়ে যায়। যদিও সহজপাঠ-এর বেশ কিছু কবিতা পঙ্‌ক্তি চিত্রকল্প শিশুর পক্ষে বেশ গুরুপাক।

৩. সহজ পাঠ শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের রচনাগুণে উৎকৃষ্ট নয়, নন্দলাল বসুর অনুপম অলংকরণ শিশুপাঠ্য গ্রন্থটিকে দৃষ্টিনন্দন করেছে, করেছে সমৃদ্ধ। নন্দলাল বসুর পরিশীলিত সাদা - কালো ছবিগুলি সহজ পাঠ-এরর অপরিহার্য সম্পদ। ইদানীং বই-বাজারে বেশ খিছু সহজ পাঠ চোখে পড়বে যেখানে নন্দলাল বসু অনুপস্থিত। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রকাশ করেছেন সহজ পাঠ, যার ছবিগুলি এঁকেছেন বিশিষ্টচিত্রশিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবিগুলি ছবি হিসেবে অবশ্যই ভালো, সম্পূর্ণ পাঠানুযায়ী ছবিগুলির রঙিন অলংকরণ ক্ষুদে পড়ুয়ার পক্ষে হয়তো সহজবোধ্য চিত্তাকর্ষক। তবে নন্দলালকৃত ছবির ভাবনাজ্ঞাপক দিকটি এখানে নেই। 'চ, ছ, জ, ঝ দলে দলে/ বোঝা নিয়ে হাটে চলে' -কোথাও কোনো ব্যক্তির ছবি নেই, হাটের পথে তালসারির ছবি এঁকে পড়ুয়ার চোখে হাটুরেদের গতি মাথায় বোঝার ইঙ্গিতদেন নন্দলাল বসু। ছবির প্রতীকী তাৎপর্য সহজ পাঠ পড়ুয়ার নাগালের বাইরে, কিন্তু সম্পূর্ণ পাঠানুসারী ছবি না হওয়ায় সেটিও স্ফতন্ত্র পাঠ হয়ে ওঠে তার কাছে।

৪. শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল রাখাল দ্বন্দ্ব সমাস উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য, ৩৪৬।

৫. সহজ পাঠ প্রথম ভাগের কবিতা এবং গদ্যের নেপথ্যে যে-স্বর বাজতে থাকে, তা অধিকাংশেই সহজ পাঠ পড়ুয়ার এক সমবয়সীর। দ্বিতীয় ভাগের আড়ালের কথকটি বয়স্ক, বাড়ির কর্তাসুলভ নির্দেশাত্মক কণ্ঠস্বরই এখানে প্রবল। অন্যদিকে যাদের প্রতি কর্তা বা কথকের নানান আজ্ঞা বা আদেশ বর্ষিত হয়েছে তারা বড্ডো বেশি চুপচাপ। কথার প্রেক্ষিতে কথা বা কোনো 'কাজ'কে কেন্দ্র করে যুক্তি- পরামর্শ, আলাপন নেই বললেই চলে। পাঠের পর পাঠ জুড়ে ওই কথকেরই একোক্তি, যার অধিকাংশই নির্দেশাত্মক। একতরফা হুকুম, আদেশেরবিপরীতে ঘাড় নিচু করে হুকুম পালনের জন্যই যেন 'ওরা' নীরব যন্ত্রবৎ।

সহজ পাঠ দ্বিতীয় ভাগের কয়েকটি পাঠে ওদের কতিপয় স্বর শোনা যায়, যেমন, 'ওটা কি কান্নার শব্দ না রান্নাঘর থেকে বিড়াল ডাকছে, যাও না উল্লাস থামিয়ে দিয়ে এসো গে, আমার ভয় করছে, বড়ো অন্ধকার। ভজ্জুকে ডেকে দিই। ছি ছি উল্লাস, ভয় করতে লজ্জা করেনা। আচ্ছা আমি নিজে যাচ্ছি (দশম পাঠ)। পাঠের কথক আর উল্লাসের কথাকে সংলাপের আকারে দেখলে দেখা যাবে এখানে উল্লাসের ভীত সন্ত্রস্ত বাক্যটিই একমাত্র স্বর।

একাদশ পাঠ-এ বেলা যখন চার প্রহর তখন কাঠুরিয়াদের সর্দার পথ দেখিয়ে নৌকোয় তাঁদের পৌঁছিয়ে দিল। শক্তিবাবু দশ টাকার নোটবের করে বললেন, 'বড়ো উপকার করেছ, বকশিশ লও।' সর্দার হাত জোড় করে বললে 'মাপ করবেন, টাকা নিতে পারব না, নিলে অধর্ম হবে।' এই বলে নমস্কার করে সর্দার চলে গেল' -এখানে একেবারে প্রান্তিকবাসী কাঠুরিয়া সর্দারের বিনম্র স্বরটি শুনতে পাওয়া যায়।অতিথিসেবার কোনো পারিশ্রমিক হয় না, হয় না শোধমূল্য, তা যেন 'ওরা' শক্তিবাবুদের স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল।

দ্বাদশ পাঠে... ডাক্তার তো ভয়ে কম্পিত। ডাকলেন 'শম্ভু'। শম্ভু বললে 'আজ্ঞে'।

ডাক্তার বললেন 'এখন উপায় কী?' শম্ভু বললে 'ভয় নেই, আমি আছি।'

ডাক্তার বললেন, 'ওরা যে পাঁচজন।

শম্ভু বললে, 'আমি যে শম্ভু'। এই বলে উঠে দাঁড়িয়ে এক লম্ফ দিল, গর্জন করে বললে, 'খবর্দার'।

এই প্রথম পাঠ, যেখানে সংলাপের সুর প্রতিফলিত হয়েছে ডাক্তার বিশ্বম্ভর বাবুর সশঙ্কিত ডাকে শম্ভুর আনুগত্য এবং অসীম সাহসিকতার সঙ্গে ডাক্তারকে অভয়দানই স্বরটিতে স্পষ্ট হয়েছে।

ত্রয়োদশ পাঠে উদ্ধব হাতজোড় করে বললে 'আমার দশ পয়সাও নেই। কাল কন্যার বিবাহ, কাজ শেষ হয়ে যাক, তার পরে আমাকে শাস্তি দেবেন।' -ভূস্বামী দুর্লভবাবুর দণ্ডাদেশ এবং জরিমানার মুখে সদ্‌গোপবংশীয় উদ্ধব মণ্ডলের স্বরে কাকুতি-মিনতি বড়ো হয়ে উঠেছে।

৬. সহজ পাঠ প্রথম ভাগ/ দ্বিতীয় ভাগ জুড়েই 'ওরা' কাজ করে। কাগেজ খাতা মেনে এক গোত্র বিন্যাস -

'ওরা'	কাজ করে	পেশাগত পদবি
ক খ গ ঘ	জেলে ডিঙ্গি চলে বেয়ে	জেলে
চ ছ জ ঝ	বোঝা নিয়ে হাটে চলে	হাটুরে
ট ঠ ড ঢ	কাঁধে নিয়ে ঢাক ঢোল	ঢুলি
প ফ ব ভ	সারা দিন ধান কাটে	চাষি/ কামিন
ম	ধান নিয়ে যায় বাড়ী	গাড়োয়ান
খুদিরাম	পাড়ে জাম	ব্যবসায়ী (?)
মধু রায়	খেয়া বায়	মাঝি
জয়নাল	ধরে হাল	মাঝি/নাবিক
অবিনাশ	কাটে ঘাস	ঘাসুড়ে (?)
হরিহর	বাঁধে ঘর	ঘরামি (?)
গুরুদাস	কাটে ঘাস	চাষি
ভোলা মালি	মালা নিয়ে ছোটে	মালি
ভারী	আনে ঘড়া ঘড়া জল	ভারী
মুটে	আনে সরা খুরি কলাপাতা	মুটে
বামি	সে মাটি দিয়ে নিজে ঘাটি মাজে	পরিচারিকা
বুড়ি দাসী	আনে জল	পরিচারিকা
হরি মুদী	চাল ডাল বেচে তেল নুন ব্যবসায়ী	
চুনী মালি	কুয়ো থেকে জল তোলে মালি	
কৈলাস	ফাই - ফরমাশ খাটে	চাকর
লোকা ধোবা	কাপড় কাচে	ধোবা
কৌলু	ফাই ফরমাশ খাটে	চাকর
দ্বিতীয় ভাগঃ		
বংশীবদন	কলসি হাঁড়ি বিক্রি করে	কুমোর
ভিঙ্গি মেথর	আবর্জনা পরিস্কার করে মেথর	
ইন্দু, রঙ্গ বেহারা, বিন্দু	ঘরোয়া নানান কাজে লাগে	পরিচারক/ পরিচারিকা
কান্ত	ফাই-পরমাশ খাটে	চাকর
বোষ্টমি	গান গেয়ে বেড়ায়	চাকর
উল্লাস, বাঞ্ছা,		

মন্টু	গেরস্তালির নানান কাজে লাগে	পরিচারক
শম্ভু সিং, আক্রম মিশ্র	পাহারা দেয়	দারোয়ান
কাঠুরিয়া/সর্দার	কাঠ কাটা	কাঠুরিয়া
শম্ভু	ডাক্তারের আত্মরক্ষী	চাকর